আগেভাগে লক্ষ্মীপুজো করে লাভ কী হল

জহর সরকার

বৈচিত্রের মাঝে মহান ঐক্য নিয়ে কাব্য অনেক হয়েছে। কিন্তু সেই ঐক্য কী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল? ‘অনেক দীপাবলি’র কাহিনি আমাদের তার একটা আভাস দিতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের ‘এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে’ থেকে নেহরুর ‘বৈচিত্রের মাঝে ঐক্য’— কথাটা কাব্যময় ভাষায় বহু ভাবে বলা হয়েছে। কিন্তু এই ‘ঐক্য’ বাস্তবে কী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেটা বুঝতে চাইলে আমাদের আর একটু গভীরে যেতে হবে। দীপাবলি তার একটা চমৎকার উপলক্ষ।

এই উৎসবের প্রথম উল্লেখ পাই রামায়ণে, রামচন্দ্র যখন যুদ্ধজয় করে সীতাকে নিয়ে ফিরলেন, তখন অযোধ্যার ঘরে ঘরে দীপালিকায় আলো জ্বলেছিল। সেখানে অবশ্য লক্ষ্মীর কোনও নামগন্ধ নেই। তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীতে রামায়ণের মোটামুটি সমসাময়িক বাৎস্যায়নের কামসূত্রে যক্ষের রাত্রির কথা আছে, যে রাতে ছোট ছোট প্রদীপ জ্বালিয়ে জনপদ সাজাতে হয়। এটি এক লোকাচার, যা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র ক্রমশ গ্রহণ করে নিয়েছিল। কিন্তু এখানেও লক্ষ্মীর কোনও প্রত্যক্ষ উল্লেখ নেই। অবশ্য যক্ষ থেকে যেমন ঐশ্বর্যের দেবতা কুবের এলেন, লক্ষ্মী যদি তেমনই এসে থাকেন, তা হলে আলাদা কথা। তবে এটা ঠিকই যে, পুরাণের দেবী লক্ষ্মী এক সময় যক্ষদের দীপালোকিত রাত্রির উৎসবটি নিজের করে নেন।

ইতিহাস থেকে ভূগোলে যাওয়া যাক। হিন্দি বলয়ের হৃদয়পুরে দীপাবলি উৎসব শুরু হয় ধনতেরাস থেকে, শেষ হয় ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায়— পুরো পাঁচ দিন। ধনতেরাসের পরে হয় ‘ছোটি দীপাবলি’, তার পরে মূল দীপাবলি ও লক্ষ্মীপূজা। গোবর্ধনপূজায় কৃষ্ণের আরাধনাও হয়, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গরুর সেখানে বিশেষ ভূমিকা। তার পরে আসে ‘ভাই দুজ’। দাক্ষিণাত্যে গণেশ, শিব এবং বিষ্ণুকেও লক্ষ্মীর পাশাপাশি প্রভূত ভক্তিসহকারে পূজা করা হয়।

দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে এবং পশ্চিমের মহারাষ্ট্র ও গোয়াতেও পাঁচ দিনের দীপাবলি হয়। সেখানে অবশ্য প্রধান উপজীব্য হল কৃষ্ণ এবং তাঁর সহধর্মিণীর হাতে নরকাসুর বধের কাহিনি। এই অসুরটিও অনেকটা মহিষাসুরের মতোই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে খুব উৎপাত শুরু করেছিল। দেবতা ও মুনিঋষিদের ষোলো হাজার মেয়েকে সে বন্দি করে রেখেছিল। তাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অভিভাবকরা স্বভাবতই কৃষ্ণের শরণাপন্ন হন। মেয়েদের দখল নেওয়া চিরকালই অনেক যুদ্ধের সৃষ্টি করেছে, সীতা এবং হেলেন অব ট্রয় থেকে নাইজেরিয়ায় বোকো হারাম গোষ্ঠীর হাতে অপহৃতা মেয়েরা অবধি সে কাহিনি অব্যাহত। লক্ষণীয়, বাঙালি মহালয়ায় যে পিতৃতর্পণ করে, দক্ষিণ ভারতে সেটা করা হয় এই সময়। আমরা সবাই একটা কঠিন যুদ্ধ শুরু হওয়ার ঠিক আগে পূর্বপুরুষদের স্মরণ করি!

নরকাসুর বধের গল্পটা দক্ষিণ ভারতে একটু অন্য মাত্রা পায়। সেখানে যুদ্ধক্ষেত্রে কৃষ্ণ মূর্ছা যান, তখন তাঁর স্ত্রী সত্যভামা অসুরকে পরাজিত করেন। এই কাহিনিতে আমাদের মহিষাসুরমর্দিনীর ছায়া পড়ে না? অন্ধ্র, কর্নাটক এবং কেরলে আবার এই কাহিনিতে মহাবলী যুক্ত হন, অনেক জায়গায় একটা ‘বালী প্রতিপদ’ও উদ্‌যাপন করা

অন্যতমা। দীপাবলির প্রস্তুতি। হায়দরাবাদ, অক্টোবর ২০১৪। *এএফপি*

হয়। গোয়ায় নরকাসুরের বিরাট মূর্তি গড়ে তা পোড়ানো হয়, দশেরার রাবণ-দাহের মতো। তেলুগুরা যম-দ্বিতীয়া পালন করেন। লক্ষ করার ব্যাপার, এই সময়টাতে যম ঘুরে ঘুরে আসেন, বাঙালির ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতেও যমের টিকা দিতেই হয়। যমের কথা বললেই কঠোপনিষদে নচিকেতার কাহিনি মনে পড়বে। আবার পুরাণে আছে হিম রাজা ও তাঁর ষোলো বছরের পুত্রের কাহিনি। রাজপুত্রের কোষ্ঠীতে ছিল, বিয়ের পরে সাপের কামড়ে তার মৃত্যু হবে। মনসামঙ্গলের বেহুলার গল্পেরই রকমফের, তফাত কেবল এই যে, এখানে নতুন বউটি তার রত্নালঙ্কারের জৌলুসে যমের সঙ্গী সাপের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল। এই কাহিনিই নাকি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ধনতেরাস উদ্‌যাপনের পিছনে, এবং দীপ জ্বালানোকেও বলা হয় *যমদীপদান।*

এই উৎসবে পরিচ্ছন্নতার উপর খুব জোর দেওয়া হয়, পুণ্যস্নান এর একটা বড় অঙ্গ। দক্ষিণে সেই স্নান হয় প্রচুর তেল সহযোগে, মহারাষ্ট্রে তেলের সঙ্গে সুগন্ধির ব্যবহারও বহুলপ্রচলিত। নতুন জামা পরতেই হয়, বাড়িঘর পরিষ্কার করতে হয়, নতুন রং করার রীতিও বহুলপ্রচলিত। ‘স্বচ্ছ ভারত’-এর কথা এই উৎসবের ইতিহাসেই প্রথম পাওয়া যায়। হিন্দু আচারে নিজের দেহ এবং নিজের বাড়ি পরিষ্কার করার উপর যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, জনপরিসর পরিচ্ছন্ন রাখতে অবশ্য সেই গুরুত্ব দেওয়া হয়নি! ভারী দুঃখের কথা বটে।

লক্ষ্মীর কথায় ফেরা যাক। পুরাণে আছে, সমুদ্রমন্থনের সময় তিনি দেবতা এবং অসুরদের সামনে প্রথম আবির্ভূত হন। তাঁর সঙ্গে জল, পদ্ম এবং হাতির খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ লক্ষ করা যায়। বোঝা যায়, এর সঙ্গে ধান্যপ্রধান কৃষিসভ্যতার একটা সম্পর্ক আছে, তথাকথিত আর্যরা যমুনা পার হওয়ার পরে এবং গঙ্গাবিধৌত অঞ্চলে জলাজঙ্গল পরিষ্কার করে চাষবাস শুরু করার পরে যে সভ্যতা বিস্তার লাভ করে।

এই সূত্রেই এসেছে গজলক্ষ্মীর রূপকল্পনা: দেবী পদ্মফুলের উপর দাঁড়িয়ে, দু’পাশে দুটি হাতি

ব্রাহ্মণ্যবাদ এই বিভিন্ন ধারাকে একটা সাধারণ ঐক্যের সূত্রে গ্রথিত করে বিভিন্ন আঞ্চলিক উৎসবকে দেশের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে একটা বড় ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

তাঁকে স্নান করিয়ে দিচ্ছে। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর শক রাজা আজিলসেস-এর একটি মুদ্রায় এই রূপ দেখা গেছে, তাতেই বোঝা যায় ধারণাটি কত প্রাচীন। মোদ্দা কথা হল, ধরণী শস্যশালিনী হলেই প্রচুর সম্পদ আসে এবং তখনই সম্পদের দেবী ধনলক্ষ্মী, ধান্যলক্ষ্মী, গজলক্ষ্মী, নানান নামে পূজিত হন।

চঞ্চলা বলে লক্ষ্মীর দুর্নাম আছে। হিন্দুধর্ম কখনওই সম্পদের সাধনাকে ছোট করেনি। কিন্তু তা হলে কেন লক্ষ্মীর আরাধনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে জুয়াখেলার আচার? যেটুকু সম্পদ আছে তা উড়িয়ে দেওয়া কেন? এর একটা প্রেরণা এসেছে অবশ্যই কৈলাস পর্বত থেকে, পার্বতী নাকি সেখানে পাশাখেলায় মহাদেবকে হারিয়ে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, দীপাবলিতে জুয়া খেললে মানুষ সারা বছর সম্পদশালী হবে।

বাঙালি আজ যা করে, ভারত নাকি কাল তা করবে। লক্ষ্মীর আরাধনায় বাঙালি অনেকটা এগিয়ে— দীপাবলির পক্ষকাল আগেই তার কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো সারা হয়ে যায়। তবে পুজো আগেভাগে সেরে ফেললেও মা লক্ষ্মীর বিশেষ আশীর্বাদ সে পেয়েছে বলে মনে হয় না। এ বিষয়ে আমাদের কিছু একটা করা দরকার!

আলোক এবং সম্পদ থেকে এ বার একটু অন্ধকারের দিকে তাকানো যাক। কার্তিক অমাবস্যা বছরের সবচেয়ে তমসাময় রাত্রি বলে খ্যাত। সব দেশেই ভূতের গল্প অগণিত। সে সব গল্পে অন্ধকার রাত্রে রকমারি প্রেতাত্মা ও রাক্ষসকুল বেরিয়ে আসে, ভূতের নৃত্যে মাতে। বাঙালিও বিশেষ ভাবে স্মরণ করে ডাকিনী যোগিনীদের, যারা মা কালীর সঙ্গে আসে। তান্ত্রিক মতে ডাকিনীরা ভয়ঙ্কর, তারা কাঁচা মাংস খায়, কিন্তু যোগিনীরা বংশপরিচয়ে অনেক সম্মানিত, ভারতে ৬৪টি যোগিনী মন্দির আছে। এই দেবী বা উপদেবীদের যে সমস্ত ভয়ানক ক্ষমতার কথা বলা হয়, তাতে বোঝা যায়, তারা এক কালে অশুভ শক্তি হিসেবেই গণ্য হত, তার পর এক সময় তাদের এক ধরনের দেবতা হিসেবে মেনে নিয়ে তুষ্ট করা হয়। কালীর ভক্তরা তাঁকে মাতৃস্নেহ এবং শক্তির জন্য পুজো করেন।

নরকাসুর এবং মহাবলী, লক্ষ্মী এবং তাঁর পদ্মফুল ও হাতি, সম্পদ এবং জুয়া, কালী ও তাঁর ডাকিনী-যোগিনীর অমাবস্যা— একটু খেয়াল করলেই বোঝা যাবে, এগুলি বিভিন্ন অঞ্চলের নিজস্ব ইতিহাস থেকে উঠে আসা বিভিন্ন ঘটনা এবং জনস্মৃতির উত্তরাধিকার বহন করছে। ব্রাহ্মণ্যবাদ এই বিভিন্ন ধারাকে একটা সাধারণ ঐক্যের সূত্রে গ্রথিত করে বিভিন্ন আঞ্চলিক উৎসবকে দেশের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে একটা বড় ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। ভারতের জটিল ধর্মীয় ইতিহাসের একটা ঝাঁকিদর্শনের চেষ্টা করলাম, এমন বিপুল ‘বৈচিত্র’-এর মধ্যে বাস্তবে কী ভাবে ‘ঐক্য’ প্রতিষ্ঠিত হল, যদি সে বিষয়ে কিছুটা আঁচ পাওয়া যায়।

প্রসার ভারতীর সিইও। মতামত ব্যক্তিগত